যখন তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে পৌঁছেন, তখন ইয়াকুব (আ) তাঁকে নিজের কাছে আনতে চান। ফুফু তাঁকে খুব আদর করতেন। তাই নিজেই রাখতে চাইলেন। সেমতে কোমরে একটি হাঁসুলি কাপড়ের ভেতরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন যে, তার হাঁসুলি চুরি হয়েছে। সবার তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কোমর থেকে তা বের হল। ফলে ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-কে ফুফুর কাছেই থাকতে হল। ফুফুর মৃত্যুর পর তিনি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে চলে আসেন। সম্ভবত এখানেও ইউসুফ (আ)-এর সম্মতিক্রমেই তাঁকে গোলাম বানানোর প্রহসন করা হয়েছিল। তাই এতে 'আযাদকে গোলাম বানানোর' অভিযোগ আসে না ; ইউসুফ (আ)-এর চরিত্র ও বিভিন্ন আলামতদৃষ্টে ভাইয়েরা অবশ্যই জানত যে, ইউসুফ চুরি করেনি--সে পবিত্র ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বেনিয়ামিনের প্রতি তাদের যে চরম আক্রোশ ছিল সে কারণে এ কথাও বলে দিল)। অতঃপর ইউসুফ সে কথাটি (যা এখনই উল্লিখিত হবে) আপন মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের সামনে (মুখে) প্রকাশ করলেন না (অর্থাৎ মনে মনে) বললেন ঃ এ (চুরির) স্তরে তোমরা তো আরও খারাপ (অর্থাৎ আমরা ভ্রাতৃদ্বয় প্রকৃত চুরি করিনি ; কিন্তু তোমরা এমন জঘন্য কাজ করেছ যে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষই গায়েব করে দিয়েছ অর্থাৎ আমাকে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। বলা বাহুল্য, মানুষ চুরি টাকা-পয়সা চুরির চাইতে জঘন্য অপরাধ)। এবং তোমরা (আমাদের ভ্রাতাদ্বয় সম্পর্কে) যা কিছু বর্ণনা করছ (যে আমরা চোর) এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এর স্বরূপ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন (যে, আমরা চোর নই। ভাইয়েরা যখন দেখল যে, তিনি বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে কব্জা করে নিয়েছেন, তখন খোশামোদের ছলে) তারা বলতে লাগল ঃ হে আযীয, এর (বেনিয়ামিনের) পিতা রয়েছেন, যিনি খুবই বয়োবৃদ্ধ (তিনি একে অত্যধিক আদর করেন। এর বিরহ-ব্যথায় আল্লাহ্ জানে তাঁর কি অবস্থা হবে। আমাদেরকে এত আদর করেন না)। অতএব আপনি (এমন করুন যে) এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন (এবং গোলাম করে নিন)। আমরা আপনাকে হৃদয়বান দেখতে পাচ্ছি। (আশা করি এ দরখাস্ত মনজুর করবেন।) ইউসুফ (আ) বললেন ঃ এমন (অন্যায়) ব্যাপার থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রেখে দেব। (যদি আমরা এমন করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা খুবই অন্যায়কারী বিবেচিত হব। (কোন মুক্ত ব্যক্তিকে গোলাম বানানো এবং তার সাথে গোলামের মত ব্যবহার করা তার সম্মতিক্রমেও হারাম)। অতঃপর যখন তারা (তার পরিষ্কার জবাবের কারণে), ইউসুফ (এর কাছ) থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন (সেখান থেকে) সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল (যে, কি করা যায়? অধিকাংশের মত হল যে, উপায় নেই। সবারই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু) তাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে বলল ঃ (তোমরা সবাই ফিরে যাওয়ার যে মত প্রদান করছ, জিজ্ঞেস করি) তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়েছেন (যে তোমরা তাকে সাথে আনবে। কিন্তু সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। অতএব আমরা সবাই তো আর বিপদে পরিবেষ্টিত হইনি যে, তদবীরের কোন অবকাশ নেই। তাই যথাসম্ভব তদবীর করা দরকার)। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ সম্পর্কে তোমরা কতটুকু ত্রুটি করেছ। (তার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পিতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেই পুরানো

লজ্জাই কি কম নাকি যে, নতুন আরেকটি লজ্জা নিয়ে যাব ?) অতএব আমি তো এখান থেকে নড়ব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে (উপস্থিতির) অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা এর একটা সুরাহা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম সুরাহাকারী। (অর্থাৎ কোন-না-কোন উপায়ে বেনিয়ামিন ছাড়া পাক। মোট কথা আমি হয় তাকে নিয়ে যাব, না হয় ডাকার পরে যাব। অতএব আমাকে এখানেই থাকতে দাও এবং) তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও এবং (গিয়ে) বল ঃ আব্বা আপনার ছেলে (বেনিয়ামিন) চুরি করে (তাই গ্রেফতার হয়েছে)। আমরা তো তাই বর্ণনা করি, যা (প্রত্যক্ষভাবে) জেনেছি। এবং আমরা (ওয়াদা-অঙ্গীকার দেওয়ার সময়) অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী ছিলাম না (যে, চুরি করবে। জ্ঞাত থাকলে কখনও ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতাম না)। এবং (যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে) ঐ জনপদ (অর্থাৎ মিসর) বাসীদের কাছে (কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে) জিজ্ঞেস করে নিন, যেখানে আমরা (তখন) বিদ্যমান ছিলাম (যখন চুরিতে ধরা পড়ে)। এবং ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করুন, যাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা (এখানে) এসেছি। (এতে বোঝা যায় যে, কেনান অথবা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার আরও লোক খাদ্যশস্য আনার জন্য গিয়েছিল)। এবং বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। (সেমতে জ্যেষ্ঠকে সেখানে রেখে সবাই দেশে ফিরে পিতার কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিয়ামিনের রসদপত্রের মধ্যে একটি শাহী পাত্র লুকিয়ে রেখে অতঃপর কৌশলে তা বের করে তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ভাইদের সামনে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হল এবং লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে তারা বলতে লাগল ঃ

إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ----অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল। সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়--বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশত সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আ)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান-প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

ইউসুফ (আ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আ) তাঁর কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ (আ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ----অর্থাৎ ইউসুফ (আ) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ০----অর্থাৎ ইউসুফ (আ)

মনে মনে বললেন ঃ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইয়ের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন ঃ তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবত জোরেই বলেছেন।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ○

ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন ঃ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালিম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا—অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল।

قَالَ كَبِيرُهُمْ الخ—তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে

ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আ)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

اِرْجِعُوْا اِلٰى اَبِيْكُمْ----অর্থাৎ বড় ভাই বললেন—আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ----অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হিফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল ঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ

انه عمل ذلك بامر الله تعالى ليزيد فى بلاء يعقوب----অর্থাৎ ইউসুফ (আ) এসব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

বিধান ও মাস'আলা ঃ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ----দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়---অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হিফাযত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাস'আলা বের করে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোন ভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না---বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি---অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন ঃ আমার সাথে 'সাফিয়্যা বিনতে হুযাই' রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়।--- (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَ

قَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৩) তিনি বললেন ঃ কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না। যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃত্যুবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন ঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না! (৮৭) বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইয়াকুব (আ) (ইউসুফের ব্যাপারে তাদের সবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই পূর্বেকার ঘটনার অনুরূপ মনে করে) বলতে লাগলেন ঃ (বেনিয়ামিন চুরিতে ধৃত হয়নি;) বরং তোমরা মনগড়া একটি বিষয় গড়ে নিয়েছ। অতএব (পূর্বেকার মত) সবরই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্র থাকবে না। আল্লাহ্র কাছ থেকে (আমার) আশা যে, তিনি তাদের সবাইকে (অর্থাৎ ইউসুফ বেনিয়ামিন ও মিসরে অবস্থানরত বড় ভাই---এই তিনজনকে) আমার কাছে একসঙ্গে পৌঁছে দেবেন। কেননা তিনি (বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে) খুবই জ্ঞাত, (তাই তিনি সবারই খবর জানেন যে, তারা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে। তিনি) খুবই প্রজ্ঞাময়। (যখনই মিলিত করতে চাইবেন, তখন হাজারো কারণ ও পন্থা ঠিক করে দেবেন)। এবং (এ উত্তর দিয়ে

তাদের পক্ষ থেকে ব্যথা পাওয়ার কারণে) তাদের দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং (এ নতুন ব্যথার ফলে পুরাতন ব্যথা তাজা হয়ে যাওয়ার কারণে ইউসুফকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন; হায় ইউসুফ! আফসোস! এবং ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে) তাঁর চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ হয়ে গেল। (কেননা অধিক কান্নার ফলে চোখের কৃষ্ণতা হ্রাস পায় এবং চোখ অনুজ্জ্বল অথবা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে) এবং তিনি (মনোবেদনায় ভেতরে ভেতরেই) ক্ষয়িত হচ্ছিলেন (কেননা, তীব্র মনোকষ্টের সাথে তীব্র দমন সংযুক্ত হলে ক্ষয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়; ধৈর্যশীলরা এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হন)। ছেলেরা বলতে লাগলঃ আল্লাহ্‌র কসম, (মনে হয়), আপনি সদাসর্বদা ইউসুফের স্মরণেই ব্যাপৃত থাকবেন; এমন কি শুকিয়ে মরণাপন্ন হয়ে যাবেন কিংবা মরেই যাবেন (অতএব এত দুঃখে ফায়দা কি?) ইয়াকুব (আ) বললেনঃ (আমার কান্নায় তোমাদের অসুবিধা কি?) আমি তো আমার দুঃখ ও ব্যথা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রকাশ করি (তোমাদেরকে তো কিছু বলি না) এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপার আমি যতটুকু জানি তোমরা জান না। ('আল্লাহ্‌র ব্যাপার' বলে হয় অনুগ্রহ, কৃপা ও রহমত বোঝানো হয়েছে, না হয় সবার সাথে মিলনের ইলহাম বোঝানো হয়েছে; প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা ইউসুফের সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যার ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছিল না কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ছিল)। বৎসগণ! (আমি তো শুধু আল্লাহ্‌র দরবারেই দুঃখ প্রকাশ করি। কারণাদির স্রষ্টা তিনিই। কিন্তু বাহ্যিক তদবীর তোমরাও কর এবং একবার আবার সফরে) যাও (এবং) ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর (অর্থাৎ এমন পন্থা অন্বেষণ কর, যদ্দ্বারা ইউসুফের সন্ধান মেলে এবং বেনিয়ামিনকে মুক্ত করা যায়) এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফির।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইয়াকুব (আ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব (আ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব (আ) বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ—অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেনঃ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকুব (আ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে যে, 'মনগড়া কথা' বলে ইয়াকুব (আ) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছেঃ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا----অর্থাৎ আশা করা যায় যে সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

মোট কথা, ইয়াকুব (আ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেন নি। এই না-মানার তাৎপর্য ছিল এই যে. প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ--অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব (আ) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেনঃ ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল বলেনঃ ইয়াকুব (আ)-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيْمٌ---অর্থাৎ অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كَظْمٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই كظم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে ঃ من يكظم الغيظ يا جره الله---অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন ঃ জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মুহূর্তে انا لله وانا اليه راجعون বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকুব (আ) এ বাক্যটির পরিবর্তে يا اسفى على يوسف বলেছেন।---বায়হাকী 'শোআবুল-ঈমানে'ও এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি ইয়াকুব (আ)-এর গভীর মহব্বতের কারণ ঃ ইউসুফ (আ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আ) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টি-শক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গম্বরসুলভ পদ-মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে 'ফিতনা' আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ انما اموالكم واولادكم فتنة অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই ঃ انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار---অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখিরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখিরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না বরং প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যই এটা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে ইয়াকুব (আ)-এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আ)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এর চাইতে বেশি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেন নি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেন নি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ (আ)-এর মত একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ্র ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কোরআনের كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। واللهُ اعلم

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ---অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সদা-সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয়

মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

ইয়াকুব (আ) ছেলেদের কথা শুনে বললেনঃ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ---অর্থাৎ আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না বরং আল্লাহ্‌র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ---অর্থাৎ বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফির ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইয়াকুব (আ) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেন নি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল কিন্তু ইউসুফ (আ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যত কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব (আ) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেনঃ আযীযে-মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব (আ) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে-মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সে-ই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ইয়াকুব (আ)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।

হাসান বসরী (রহ) বলেনঃ মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোকই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। এক. বিপদে সবর ও দুই. ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, من بث لم يصبر অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াকুব (আ)-কে সবরের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব (আ)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ একদিন ইয়াকুব (আ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আ)। হঠাৎ ইউসুফ (আ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দেব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেনঃ এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ اِنَّ
اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ
اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا
يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ
فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا
وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۭ يَغْفِرُ اللّٰهُ

لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

(৮৮) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বলল ঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে পুরাপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন ঃ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেন ঃ আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর [ইয়াকুব (আ)-এর اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ নির্দেশ মোতাবেক তারা মিসর রওয়ানা হল। কেননা, বেনিয়ামিনকে মিসরেই রেখে এসেছিল। তারা হয়ত মনে করে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে, প্রথমে তাকেই বাদশাহ্র কাছে চেয়ে আনার চেষ্টা করা দরকার। এরপর ইউসুফের ঠিকানা তালাশ করা যাবে। মোট কথা, মিসরে পৌঁছে] যখন ইউসুফ (আ)-এর কাছে (যাকে তারা আযীয মনে করত) পৌঁছল, (এবং খাদ্য-শস্যেরও প্রয়োজন ছিল। তাই মনে করল যে, খাদ্যশস্যের বাহানায় আযীযের কাছে পৌঁছব এবং খরিদ প্রসঙ্গে খোশামোদের কথাবার্তা বলব। যখন মন নরম ও প্রফুল্ল দেখব, তখন বেনিয়ামিনের মুক্তির দরখাস্ত করব। তাই প্রথমে খাদ্যশস্য নেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করল এবং) বলতে লাগল ঃ হে আযীয! আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই (দুর্ভিক্ষের কারণে) খুবই কষ্টে আছি। (আমরা এমনভাবে দারিদ্র্যে বেষ্টিত আছি যে, খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি)। আমরা কিছু অকেজো বস্তু নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি (এ ত্রুটি উপেক্ষা করে) খাদ্যশস্যের পুরাপুরি বরাদ্দ দিয়ে দিন (এবং এ ত্রুটির কারণে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস করবেন না) এবং (আমাদের কোন অধিকার নেই) আমাদেরকে খয়রাত (মনে করে) দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা খয়রাত দাতাদেরকে (সত্যিকার খয়রাত দিক বা সুযোগ-সুবিধা দান করুক, এটাও খয়রাতেরই মত) উত্তম প্রতিদান দেন (মু'মিন হলে আখিরাতেও, নতুবা শুধু দুনিয়াতেই)। ইউসুফ (তাদের কাতরোক্তি শুনে স্থির থাকতে পারলেন না এবং নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চাইলেন। এটাও আশ্চর্য নয় যে, তিনি অন্তরের নূর দ্বারা জেনে নিয়েছিলেন যে, এবার তারা তালাশ

করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং তাঁর কাছে এটাও হয় তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিচ্ছেদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। অতঃপর পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে) বললেন ঃ (বল,) তোমাদের স্মরণ আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে (ব্যবহার) করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল ? [এবং ভালমন্দের বিচার ছিল না। এ কথা শুনে প্রথমে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, ইউসুফের ঘটনার সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক ? ইউসুফ (আ) বাল্যকালে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে জন্য তারা তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল তদ্দ্বারা প্রবল সম্ভাবনা ছিলই যে, ইউসুফ সম্ভবত খুব উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে। ফলে তাঁর সামনে আমাদেরকে মস্তক নত করতে হবে। এ কারণে এ কথা শুনে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং চিন্তা করে কিছু কিছু চিনল। আরও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে] তারা বলতে লাগল ঃ সত্যি সত্যি তুমিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন ঃ (হ্যাঁ) আমিই ইউসুফ, আর এ হল (বেনিয়ামিন) আমার সহোদর ভাই। (এ কথা জুড়ে দেওয়ার কারণ নিজের পরিচয়কে জোরদার করা কিংবা এটা তাদের মিশনের সাফল্যের সুসংবাদ যে, তোমরা যাদেরকে তালাশ করতে বেরিয়েছ, আমরা উভয়েই এক জায়গায় একত্র রয়েছি)। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন (যে, আমাদের উভয়কে প্রথমে সবর ও তাকওয়ার তওফিক দিয়েছেন। এরপর এর বরকতে আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।) বাস্তবিকই যে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে এবং (বিপদাপদে) সবর করে, আল্লাহ্ তা'আলা এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তারা (সব অতীত কাহিনী স্মরণ করে অনুতপ্ত হল এবং ক্ষমা প্রার্থনার সুরে) বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয় তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং তুমি এরই যোগ্য ছিলে) এবং (আমরা যা কিছু করেছি) নিশ্চয় আমরা (তাতে) দোষী ছিলাম (আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করে দাও)। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ না, তোমাদের বিরুদ্ধে আজ (আমার পক্ষ থেকে) কোন অভিযোগ নেই। (নিশ্চিন্ত থাক। আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দোষ ক্ষমা করুন এবং তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান। [তিনি তওবাকারীর দোষ ক্ষমাই করেন। এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ)-ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাদের পিতা ইয়াকুব (আ) তাদেরকে আদেশ করেন যে যাও ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তালাশ কর। এ আদেশ পেয়ে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বেনিয়ামিন যে সেখানে আছে, তা জানাই ছিল। তাই তার মুক্তির জন্য প্রথমে চেষ্টা করা দরকার ছিল। ইউসুফ (আ) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোন কাজের সময় এসে যায়, তখন মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অজান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে। এক হাদীসে রয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি আপনা-আপনি উপস্থিত করে দেন। তাই ইউসুফকে তালাশ করার জন্যও অজান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্যশস্য চাওয়ার

বাহানায় আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত হবে এবং তাঁর কাছে বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদন করা যাবে।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا الخ—অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল ঃ হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারক হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবূল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরাপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন ঃ কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُزْجَاةٌ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু যা নিজে সচল নয় বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

ইউসুফ (আ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এসময় হযরত ইয়াকুব (আ) আযীযে-মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ

ইয়াকুব সফিউল্লাহ্ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ্ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযীযে-মিসর সমীপে।

বিনীত আরয!

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ-ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্সালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আ) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের স্মরণ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতে না ?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো! এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্য বলল ঃ

أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরও কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ (আ) বললেন ঃ

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল ঃ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ আল্লাহ্র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ্ মাফ করুন। উত্তরে ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন ঃ

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ —অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন ঃ

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন ঃ

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ —অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا- বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্য সদকা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আ) তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদকা' শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদের উক্তি তাই।---(বয়ানুল কোরআন)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ—দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সদকা-খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায়

এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে অযীযে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ-ভ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফির। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালই বোঝা যায়। ---(বয়ানুল কোরআন)

এ ছাড়া এখানে বাহ্যত আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, 'আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আযীযে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। ---(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا—দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে হাহুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কোরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে বলা হয়েছে (اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ) كَنُود ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অনুগ্রহ স্মরণ না করে---শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই ইউসুফ (আ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার ঃ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক অনেক জায়গায় এ দুটি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইউসুফ (আ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবর-কারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। فَلَا تُزَكُّوْا

أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ অর্থাৎ "নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না ; আল্লাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন কে মুত্তাকী।" কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ —অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেন নি বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ
وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ
اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ
لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ
فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ
سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا
عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاۗءَ
اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ
وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۡ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ
حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاۗءَ بِكُمْ مِّنَ
الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ
لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেনঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলিঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। (৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) তারা বলল ঃ পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্‌ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন (১০০) এবং তিনি পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সিজদাবনত হল। তিনি বললেনঃ পিতঃ, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে-কার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এখন তোমরা (গিয়ে পিতাকে সুসংবাদ দাও এবং সুসংবাদের সাথে সাথে) আমার এ জামাটি (ও) নিয়ে যাও এবং এটি পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে (এবং এখানে চলে আসবেন) এবং (অন্যান্য) সব পরিবারবর্গকে (-ও) আমার কাছে নিয়ে এস (যাতে সবাই সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি। কেননা, বর্তমান অবস্থায় আমার যাওয়া কঠিন। তাই পরিবারবর্গই চলে আসুক) এবং যখন [ইউসুফ (আ)-এর সাথে কথাবার্তা হয়ে গেল এবং তাঁর কথামত জামা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং] কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হল (যার মধ্যে তারাও ছিল) তখন তাদের পিতা কাছের লোকদেরকে বলতে শুরু করলেনঃ 'তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রলাপ করছি' মনে না কর, তবে আমি একটি কথা বলব যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (মু'জিযা ইচ্ছাধীন হয় না। তাই ইতিপূর্বে তা বোঝা যায়নি। নিকটের) লোকেরা বলতে লাগলঃ আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছেন [যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তাকে ফিরে পাবেন। এ ধারণার প্রাবল্যেই এখন গন্ধ অনুভূত হচ্ছে। নতুবা বাস্তবে গন্ধ বা কোন কিছুই না। ইয়াকুব (আ) চুপ হয়ে গেলেন]। অতঃপর যখন (ইউসুফের সহি-সালামত হওয়ার) সুসংবাদবাহীরা (জামা সহ এখানে) এসে পৌঁছল, তখন

(এসেই) সে জামাটি তাঁর মুখের উপর রেখে দিল। অতঃপর (চোখে লাগাতেই মস্তিষ্কে সুগন্ধি পৌঁছে গেল এবং) তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু খুলে গেল। (এবং তারা সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর কাছে বর্ণনা করল)। তিনি (ছেলেদেরকে) বললেনঃ (কেমন), আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদি আমি যতটুকু জানি, তোমরা জান না ? (এ জন্যই আমি তোমাদেরকে ইউসুফের খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। দেখ, অবশেষে আল্লাহ্‌ আমার আশা পূর্ণ করেছেন। তাঁর কথা পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। তখন) ছেলেরা বলল ঃ পিতঃ, আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) মাগফিরাতের দোয়া করুন। (আমরা ইউসুফের ব্যাপারে আপনাকে যে সব কষ্ট দিয়েছি তাতে) আমরা অবশ্যই দোষী ছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনিও মাফ করে দিন। কেননা, স্বভাবত অন্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া সে-ই করে, যে নিজেও ধরপাকড় করতে চায় না)। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ সত্বরই পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। [এ থেকে তাঁর মাফ করে দেওয়াও বোঝা গেল। 'সত্বরই' বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের সময় আসতে দাও। এ সময় দোয়া কবূল হয়। (كذا فى الدر المنثور) মোটকথা, সবাই তৈরী হয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হল। ইউসুফ (আ) খবর পেয়ে অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন এবং বাইরেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল]। অতঃপর যখন সবাই ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি (সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করে) পিতামাতাকে (সম্মানার্থ) নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং (কথাবার্তা শেষ করে) বললেনঃ সবাই শহরে চলুন (এবং) ইনশাআল্লাহ্‌ (সেখানে)সুখ-শান্তিতে থাকুন। (বিচ্ছেদের যাতনা ও দুর্ভিক্ষের কষ্ট সব দূর হয়ে গেল। মোটকথা সবাই, মিসরে পৌঁছল এবং (সেখানে পৌঁছে সম্মানার্থ)। পিতামাতাকে (রাজ) সিংহাসনে বসালেন এবং (তখন সবার অন্তরে ইউসুফের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে) সবাই তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গেল। (এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেন ঃ পিতঃ, এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম (যে, সূর্য-চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে)। আমার পালনকর্তা এ (স্বপ্ন) কে সত্যে পরিণত করেছেন। (অর্থাৎ এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন)। এবং (এ সম্মান ছাড়া আমার পালনকর্তা আমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করেছেন। সেমতে এক) তখন অনুগ্রহ করেছেন, যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন (এবং এ রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন)। এবং (দুই) শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পর (যে কারণে সারা জীবন মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এই যে) তিনি আপনাদের সবাইকে (যাদের মধ্যে আমার ভাইও আছে)। বাইরে থেকে (এখানে) নিয়ে এসেছেন (এবং সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছেন)। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা সূক্ষ্ম তদবীর দ্বারা সম্পন্ন করেন, যা চান। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা সবকিছুর তদবীর ঠিক করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন ইউসুফ (আ) এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে

বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি, বরং অতীত ঘটনাবলীর জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন ঃ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারও জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জিযা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তাঁর জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহ্‌হাক ও মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মত ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ) -এর জন্য এটি জান্নাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আ) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ (আ)-এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নযর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তাঁরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে ইউসুফ (আ)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও জিবরাঈল ইউসুফ (আ)-কে পরামর্শ দেন যে এটি জান্নাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যদ্দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর রূপ-সৌন্দর্য এবং তাঁর সত্তাই ছিল জান্নাতী বস্তু। তাই তাঁর দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।---(মাযহারী)

وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ—অর্থাৎ তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবার-বর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে,

পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল ঃ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ—অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকুব (আ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ' মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এত দূর থেকে ইউসুফ (আ)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকুব (আ)-এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব (আ) এ গন্ধ অনুভব করেন নি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জিযা পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়---সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জিযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ—অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ—অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং ইউসুফের জামা ইয়াকুব (আ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ—অর্থাৎ আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ—বাস্তব ঘটনা

যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল ঃ আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي —ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ আমি সত্বরই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকুব (আ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা, তখনকার দোয়া বিশেষ ভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন ঃ কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে---আমি কবুল করব ? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে---আমি ক্ষমা করব ?

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ----কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ (আ) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলে---এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রিওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসুফ (আ) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসুফ (আ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে أَبَوَيْهِ --(পিতামাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ (আ)-এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব (আ) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিতা হওয়ার যোগ্য ছিলেন।(১)

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ০—ইউসুফ (আ) পরিবারের সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্যে এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ—অর্থাৎ ইউসুফ (আ) পিতামাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا—অর্থাৎ পিতামাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ (আ)-এর সামনে সিজদা করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এ কৃতজ্ঞতাসূচক সিজদাটি ইউসুফ (আ)-এর জন্য নয়---আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কারও জন্য বৈধ ছিল না ; কিন্তু সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ইউসুফ (আ)-এর সামনে যখন পিতামাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন ঃ পিতা ঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(১) কারণটি ঐ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, যাতে বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তাঁর মাতার ইন্তিকালের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। সেখানে ইউসুফ (আ)-এর বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত নেই। যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এগুলোও পরস্পর বিরোধী। রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার লেখেন ঃ বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তিকাল ইহুদীরা স্বীকার করে না। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর আপন মাতাই বোঝানো হয়েছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীরের মতে এ রেওয়ায়েতই অগ্রগণ্য। ইবনে-জরীর বলেন ঃ ইউসুফ (আ)-এর মাতার ইন্তিকালের কোন প্রমাণ নেই। কোরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যত তাই বুঝা যায়।—মোঃ তকী ওসমানী

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ (১) ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা ও মাগফিরাতের দরখাস্ত শুনে ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন ঃ অতিসত্বর তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়া করেন নি।

এ বিলম্বের কারণ হিসেবে কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, ইয়াকুব (আ) চেয়েছিলেন, প্রথমে ইউসুফের সাথে দেখা করে জেনে নেওয়া যাক যে, সে তাদের অন্যায় ক্ষমা করেছে কি না। কারণ, মযলুম ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। এমতাবস্থায় মাগফিরাতের দোয়া সময়োপযোগী ছিল না।

একথা সম্পূর্ণ সত্য ও নীতিগত যে, বান্দা তার হক আদায় না করা কিংবা ক্ষমা না করা পর্যন্ত বান্দার হকের ব্যাপারে তওবা দুরস্ত হয় না। এমতাবস্থায় শুধু মৌখিক তওবা ও ইস্তিগফার যথেষ্ট নয়।

(২) হযরত সুফিয়ান সওরী (রহ) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহুদা ইউসুফ (আ)-এর জামা এনে যখন ইয়াকুব (আ)-এর মুখমণ্ডলে রাখল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ইউসুফ কেমন আছে ? ইয়াহুদা বলল ঃ সে মিসরের বাদশাহ। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ সে বাদশাহ না ফকীর আমি তা জিজ্ঞেস করি না। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইমান ও আমলের দিক দিয়ে তার অবস্থা কিরূপ ? তখন ইয়াহুদা তাঁর তাকওয়া ও পবিত্রতার অবস্থা বর্ণনা করল। এ হচ্ছে পয়গম্বরগণের মহব্বত ও সম্পর্কের স্বরূপ। তাঁরা সন্তানদের দৈহিক সুখ-শান্তির চাইতে আত্মিক উন্নতির জন্য অধিক চিন্তা করেন। প্রত্যেক মুসলমানেরও তা অনুসরণ করা উচিত।

(৩) হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে, সুসংবাদাতা যখন ইউসুফ (আ)-এর জামা নিয়ে পৌঁছল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয় থাকায় অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন ঃ সাত দিন ধরে আমাদের ঘরে রুটিও পাকানো হয়নি। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কোন বস্তুগত পুরস্কার দিতে অক্ষম। কিন্তু দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করুন। কুরতুবী বলেন ঃ এ দোয়া ছিল তার জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার।

(৪) এ ঘটনা থেকে আরও জানা গেল যে, সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যখন তাঁর উপর আল্লাহ্র ক্রোধ নাযিল হয় এবং পরে তওবা কবূল করা হয়, তখন যে ব্যক্তি তওবা কবূলের সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তাকে তিনি তাঁর মূল্যবান বস্ত্রজোড়া খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, আনন্দের সময় উল্লাস প্রকাশার্থে বন্ধু-বান্ধবকে ভোজে দাওয়াত করাও সুন্নত। হযরত ফাররূকে আযম (রা) যখন সূরা বাক্বারা খতম করতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে একটি উট যবেহ্ করে সবাইকে ভোজে আপ্যায়িত করতেন।

(৫) ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা বাস্তব ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পিতা ও ভাইয়ের

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এতে বোঝা গেল যে, হাতে বা মুখে কাউকে কষ্ট দিলে অথবা কারও কোন পাওনা থাকলে তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া জরুরী।

সহীহ্ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যার যিম্মায় অপরের কোন আর্থিক প্রাপ্য থাকে কিংবা সে অপরকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করে দেওয়া কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। কিয়ামতের পূর্বেই তা করা উচিত। কিয়ামতের দিন আর্থিক পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। তাই তার সৎকর্মসমূহ প্রাপককে দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সে রিক্তহস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তার কর্মসমূহ যদি সৎ না হয়, তবে প্রতিপক্ষের গোনাহ্র বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। اعوذ بالله

ইউসুফ (আ)-এর সবর ও শোকরের স্তর ঃ এরপর ইউসুফ (আ) পিতামাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ (আ)-এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতামাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতামাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে? দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহ্র রসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আ)-এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেন: وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ

مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইউসুফ (আ)-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়। এক. ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। দুই. পিতামাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং তিন. কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে---কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেন নি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে,

ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তাই যে কোনভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেন নি।---(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতামাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এই নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আ)-এর বাসভূমি গ্রামে ছিল সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল---অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ অর্থাৎ মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

ইউসুফ (আ) দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন ঃ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ---অর্থাৎ আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ○

(১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন বিষয় যথাযথ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সজ্জনদের সাথে মিলিত করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এরপর সবাই হাসিখুশি জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এক সময় ইয়াকুব (আ)-এর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসে। ওফাতের পর ওসিয়ত মোতাবেক মৃতদেহ সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্বপুরুষগণের সমাধিপার্শ্বে দাফন করা হয়। এরপর ইউসুফ (আ)-এর মনেও পরকালের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায় এবং তিনি দোয়া করেন ঃ] হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে (সব রকম নিয়ামতই দিয়েছেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণও। বাহ্যিক এই যে, উদাহরণত) রাজত্বের বড় অংশ দিয়েছেন এবং (আভ্যন্তরীণ এই যে, উদাহরণত) আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন (যা একটি মহান বিদ্যা, বিশেষ করে তা যদি নিশ্চিত হয়। ব্যাখ্যার নিশ্চয়তা নির্ভর করে ওহীর উপর। সুতরাং এর অস্তিত্ব নবুওয়তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনি আমার কার্যনির্বাহী ইহকালে ও পরকালে (অতএব ইহকালে যেমন আমার সব কাজ নির্বাহ করেছেন, রাজত্ব দান করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন, তেমনি পরকালের কাজও সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিন। অর্থাৎ আমাকে) আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (অর্থাৎ আমার যে সব পূর্বপুরুষ মহান পয়গম্বর ছিলেন, আমাকেও তাঁদের স্তরে পৌঁছে দিন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল

ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পরিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গম্বরগণই হতে পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র।--(মাযহারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না, বরং সর্বদাই এ সব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়।

এ পর্যন্ত কোরআনে বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর বিস্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হল। এর পরবর্তী কাহিনী কোরআন পাক অথবা কোন মরফু' হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদ ঐতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন।

তফসীর ইবনে-কাসীরে হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ) যখন কূপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল (১৭) সতের বছর। এরপর পিতার কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেনঃ কিতাবী সম্প্রদায়দের রেওয়ায়েতে আছে যে, ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। এরপর ইয়াকুব (আ) মিসরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

তফসীর কুরতুবীতে ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিসরে চব্বিশ বছর অবস্থান করার পর ইয়াকুব (আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পূর্বে তিনি ইউসুফ (আ)-কে ওসিয়ত করেন যেন তাঁর মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক (আ)-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেনঃ ইয়াকুব (আ)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে বায়তুল-মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণেই সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে যায় যে, তারা মৃতদেহ দূর-দূরান্ত থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে এনে দাফন করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বয়স ছিল একশ সাতচল্লিশ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেনঃ ইয়াকুব (আ) পরিবারবর্গসহ যখন মিসরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবর্তীকালে ইয়াকুব (আ)-এর আওলাদ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল যখন মূসা (আ)-এর সাথে মিসর থেকে বের হয়, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সত্তর হাজার।----(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর)

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আযীযে-মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহ্‌র উদ্যোগে ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন।

তওরাত ও কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আছে, তাঁর গর্ভে ইউসুফ (আ)-এর দুই ছেলে ইফরায়ীম ও মনশা এবং এক কন্যা 'রহমত বিনতে ইউসুফ' জন্মগ্রহণ করেন। রহমতের বিয়ে হযরত আইউব (আ)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরায়ীমের বংশধরের মধ্যে মূসা (আ)-এর সহচর ইউশা ইবনে-নুন জন্মগ্রহণ করেন।--(মাযহারী)

হযরত ইউসুফ (আ) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং নীলনদের কিনারায় সমাহিত হন।

ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, মূসা (আ)-কে যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, ইউসুফের মৃতদেহ মিসরে রেখে যাবেন না, বরং সাথে নিয়ে সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে মূসা (আ) খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ, ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এর পাশে দাফন করেন।---(মাযহারী)

ইউসুফ (আ)-এর পর মিসর দেশ 'আমালিক' গোত্রের ফেরআউনদের করতলগত হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে ইউসুফ (আ)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, কিন্তু বিদেশী হওয়ার অজুহাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন।---(মাযহারী)

নির্দেশ ও বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পিতামাতার প্রতি সম্মানসূচক সিজদা তখন জায়েয ছিল বলেই তাঁর পিতামাতা ও ভ্রাতারা সিজদা করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তে সিজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামত। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম। কোরআন পাকে বলা হয়েছে

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ--সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা কর না। হাদীসে আছে, হযরত মুয়ায সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খৃস্টানরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সিজদা করে, তখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করতে উদ্যত হন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিষেধ করে বললেন ঃ যদি আমি কাউকে সিজদা করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সিজদা করে। এমনিভাবে হযরত সালমান ফারিসী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ لَا تَسْجُدْ لِيْ يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ --অর্থাৎ

সালমান, আমাকে সিজদা করো না; বরং ঐ চিরজীবীকে সিজদা কর, যার ক্ষয় নেই।---(ইবনে-কাসীর)

এতে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয নয়, তখন আর কোন বুযুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েয হতে পারে?

هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ----থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন পরও প্রকাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে।
—(ইবনে-জরীর, ইবনে কাসীর)

قَدْ اَحْسَنَ بِيْ----দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুন্নত।

اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ----থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সূক্ষ্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا ---বাক্যে ইউসুফ (আ) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ্ হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সংসারের দুঃখ-কষ্টে পেরেশান ও অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা দুরস্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করবে, ইয়া আল্লাহ্, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং যখন মৃত্যু শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا
اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ
﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾
وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ

عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝ أَفَأَمِنُوْا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرٰى أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। (১০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (১০৭) তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিন ঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই---আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্‌ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূর্বে ছিল? সংযমকারীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম! তারা কি এখনও বুঝে না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কাহিনী (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, আপনার জন্য) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ। (কেননা এটা জানার কোন বাহ্যিক উপায় আপনার কাছে ছিল না, শুধু) আমি(-ই)

ওহীর মাধ্যমে আপনাকে এ কাহিনী বলছি এবং (বলা বাহুল্য) আপনি তাদের (ইউসুফ ভ্রাতাদের) কাছে তখন ছিলেন না, যখন তারা (ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার) স্বীয় অভিসন্ধি পাকাপোক্ত করেছিল এবং তারা (এ সম্পর্কে) তদবীর করেছিল (যে, তারা পিতার কাছে এমন বলবে, যাতে তারা তাকে এমনভাবে নিয়ে যায় ইত্যাদি। এভাবে এটা নিশ্চিত যে, আপনি এ কাহিনী কারও কাছে শুনেন নি। অতএব, এটা নবুয়তের এবং ওহী প্রাপ্তির পরিষ্কার প্রমাণ) এবং (নবুয়তের প্রমাণাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও) অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না; যদিও আপনি কামনা করেন আর (তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনি তাদের কাছে এর (কোরআনের) জন্য কোন বিনিময় চান না (যাতে এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তারা এ কোরআন কবুল না করলে আপনার পারিশ্রমিক পণ্ড হয়ে যাবে)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) তো শুধু বিশ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ। (কেউ না মানলে তাতে তারই ক্ষতি।) এবং (এরা যেমন নবুয়ত অস্বীকার করে, এমনিভাবে প্রমাণাদি সত্ত্বেও একত্ববাদ অস্বীকারকারীও রয়েছে। সেমতে) বহু নিদর্শন রয়েছে (যেগুলো একত্ববাদের প্রমাণ) নভোমণ্ডলে (যেমন, নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি) এবং ভূ-মণ্ডলে; (যেমন পদার্থ ও উপাদান,) যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে থাকে) এবং তারা এগুলোর প্রতি (সামান্যও) মনোযোগ দেয় না। (অর্থাৎ এগুলো দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করে না।) এবং অধিকাংশ লোক, যারা আল্লাহ্‌কে মানে, তারা সাথে সাথে শিরকও করে। (অতএব একত্ববাদ ব্যতীত আল্লাহ্‌কে মানা, না মানারই শামিল। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে এবং নবুয়তের সাথেও কুফরী করে।) অতএব (আল্লাহ্ ও রসূলে অবিশ্বাসী হয়েও) তারা কি এ ব্যাপারে নিরুদ্বেগ হয়ে বসেছে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথবা তাদের কাছে অতর্কিত কিয়ামত এসে যাবে এবং তারা (পূর্ব থেকে) টেরও পাবে না? (উদ্দেশ্য, কুফরের পরিণাম হচ্ছে শাস্তি; দুনিয়াতে নাযিল হোক কিংবা কিয়ামতের দিন পতিত হোক। অতএব তাদের উচিত ভয় করা এবং কুফরী পরিত্যাগ করা।) আপনি বলে দিন ঃ আমি (একত্ববাদ ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আহ্‌বায়ক হওয়ার) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেই---আমি নিজেও এবং আমার অনুসারীরাও। (অর্থাৎ আমার কাছেও তওহীদ ও রিসালতের প্রমাণ রয়েছে এবং আমার সঙ্গীরাও প্রমাণের ভিত্তিতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি প্রমাণহীন বিষয়ের প্রতি কাউকে দাওয়াত দেই না। প্রমাণ শোন এবং বুঝ। অতএব আমার পথের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ এক এবং আমি দাওয়াতদাতা) এবং আল্লাহ্ (শিরক থেকে) পবিত্র এবং আমি (এ পথ কবুল করি এবং) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (তারা যে নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করে যে, নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত, এটা অর্থহীন বাজে কথা। কেননা) আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মধ্য থেকে যতজনকে (রসূল করে) প্রেরণ করেছি, তারা সবাই মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। (কেউ ফেরেশতা ছিল না। যারা তাদেরকে মানেনি এবং এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এরাও শাস্তি পাবে---ইহকালে হোক কিংবা

পরকালে। এরা যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে) এরা কি (কোথাও) দেশ ভ্রমণে যায়নি যে, (স্বচক্ষে) তাদের পরিণাম দেখে নিত, যারা তাদের পূর্বে (কাফির হিসাবে) গত হয়েছে? (এবং মনে রেখো, যে দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত হয়ে তোমরা কুফরের পথ ধরেছ, তা ধ্বংসশীল ও তুচ্ছ,) নিশ্চয় পরজগত তাদের জন্য খুবই উত্তম, যারা (শিরক ইত্যাদি থেকে) সংযমী হয় (এবং একত্ববাদ ও আনুগত্য অবলম্বন করে)। অতএব, তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না (যে ধ্বংসশীল ও ভিত্তিহীন বস্তু ভাল, না চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বস্তু ভাল)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী পুরাপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

---অর্থাৎ এই কাহিনী ঐ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না।) অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেন নি। সবার আরও জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছেঃ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ----অর্থাৎ কোরআন অবতরণের পূর্বে এ সব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেনঃ ইহুদী ও কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলঃ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়---আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছেঃ

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝---অর্থাৎ আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়, বরং পরকালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে এরা জেদ ও হঠকারিতাবশত কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশে শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্র যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ---অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে কাসীর বলেনঃ যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মসনদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ রিয়া (লোক-দেখানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে।---(ইবনে কাসীর) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফিকাহ্‌বিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ তোমরা মান অথবা না মান---আমার তরীকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব---আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এতে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ্‌র সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেনঃ সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐ সব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেনঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। ---(মাযহারী)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ---অর্থাৎ আল্লাহ্ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্র 'বান্দা' এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসাবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহ্র রসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছেঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ্র রসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার---মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত-দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্র আযাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছেঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

অর্থাৎ তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহিযগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভাল?

বিধান ও নির্দেশঃ অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ---এগুলোর সব অদৃশ্যের সংবাদ,

যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩ আয়াতে মরিয়মের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হুদের ৪৮ আয়াতে নূহ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

—এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস-গ্রন্থসমূহে বিস্তর মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলিমুল-গায়ব' (অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ---এতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গায়ব হতে পারে না। এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোন রসূল অথবা ফেরেশতাকে শরীক মনে করা তাদেরকে আল্লাহ্র সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খৃস্টানদের অপকর্ম; তারা রসূলকে আল্লাহ্র পুত্র এবং আল্লাহ্র সত্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল-গায়ব', একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে অবহিত করেন। কোরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বোঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কোরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ এর বেশি নয় যেঃ

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چوں بمعنی رفت آرام اوفتاد

অর্থঃ জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাৎপর্যে পৌঁছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাসীর ব্যাপক সংখ্যক আলিমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেন নি। কোন কোন আলিম কয়েক-জন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবি সারা, হযরত মূসা (আ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলিমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুয়ত ও রিসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই اَهْلِ الْقُرٰى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণত শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন। অজ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হয় নি। কারণ, সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন। ---(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ)

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١١٠ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۭ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝١١١

(১১০) এমনকি, যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা

উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়ত।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাবের বিলম্ব দেখে যদি তোমরা কাফিরদের উপর আযাব আসবে না বলে সন্দেহ কর, তবে তা তোমাদের ভুল। কারণ, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদেরকেও সুদীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।) এমনকি (সময়ের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার কারণে) রসূলগণ (এ ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে গেলেন (যে আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর আযাব আসার যে সময় নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছিলাম যে, অমুক সময়ে কাফিরদের উপর আযাব আসবে, ফলে আমাদের প্রাধান্য ও সততা প্রতিষ্ঠিত হবে) এবং তাদের প্রবল ধারণা হল যে, (আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণে) আমরা ভুল করেছি, (কারণ, সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই শুধু ইঙ্গিত অথবা আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্রুত আসার কামনা ছাড়াই আমরা নিকটতম সময় নির্ধারণ করেছি, অথচ আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনির্ধারিত। এমন নৈরাশ্যের অবস্থায়) তাদের কাছে আমার সাহায্য আগমন করে (অর্থাৎ কাফিরদের উপর আযাব আসে)। অতঃপর (ঐ আযাব থেকে) আমি যাকে চেয়েছি, তাকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) বাঁচানো হয়েছে এবং (এ আযাব দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ) আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায়কে রেহাই দেয় না (বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করে, যদিও দেরীতে করে থাকে। কাজেই মক্কার কাফিরদেরও ধোঁকায় পড়ে থাকা উচিত নয়)। তাদের (পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও উম্মতদের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য (বিরাট) শিক্ষা রয়েছে (অর্থাৎ যারা শিক্ষা অর্জন করে, তারা বুঝতে পারে যে, আনুগত্যের এই পরিমাণ আর অবাধ্যতার এই পরিমাণ)। এ কোরআন (যাতে এসব কাহিনী রয়েছে) কোন মনগড়া কথা নয় (যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না), বরং এটি পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের সমর্থক এবং প্রত্যেক (জরুরী) বিষয়ের বিবরণদাতা এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের উপায়। (সুতরাং এমন গ্রন্থে শিক্ষা গ্রহণের যে সব বিষয়বস্তু থাকবে, সেগুলি দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই জরুরী।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন

হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে-আ'দ ও কওমে-সামূদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থির-তার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاۗءَهُمْ نَصْرُنَا

فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاۗءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফিরদের উপর আযাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযায়ী কাফিরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের অনুসারী মু'মিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আযাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফিরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوا শব্দটি প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, كُذِبُوا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্য মুজতাহিদদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোন বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হল না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফিরদের উপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ্ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوا-ও পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوا ক্রিয়াপদটি تكذيب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু

বলেছিলেন, তা পূর্ণ হল না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ — অর্থাৎ পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ——অর্থাৎ এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইন্‌জীলেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন ঃ যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।---(মাযহারী)

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ——অর্থাৎ এ কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরী। ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়ত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফিরদের জন্যও কোরআন রহমত ও হিদায়ত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হিদায়ত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবূ মনসূর বলেন ঃ সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

سورة الرعد

সূরা রা'দ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝٢ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣ وَفِي الْاَرْضِ
قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي
الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ্, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে

কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং যমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে---একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জুর রয়েছে---একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দেওয়া হয়। আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম-রা---(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ যেগুলো আপনি শুনছেন) আয়াত এক মহা-গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের)। এবং যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতরণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ সত্য (এবং তা বিশ্বাস করা সবার উচিত ছিল) কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (এ পর্যন্ত কোরআনের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তওহীদের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে, যা কোরআনের প্রধান লক্ষ্য।) আল্লাহ্ এমন (শক্তিশালী) যে তিনি আকাশসমূহকে খুঁটি ব্যতীতই উর্ধ্বদেশে উন্নীত করে দিয়েছেন। তোমরা এগুলোকে (অর্থাৎ আকাশসমূহকে এমনিভাবে) দেখছ। অতঃপর (স্বীয় সিংহাসনে) আরশের উপর (এমনভাবে) অধিষ্ঠিত (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত)। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। (এতদুভয়ের মধ্যে) প্রত্যেকটি (নিজ নিজ কক্ষপথে) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান হয়। তিনিই (আল্লাহ্) প্রত্যেক কাজ (যা কিছু ঘটে) পরিচালনা করেন, (এবং সৃষ্টিগত ও আইনগত) প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন---যাতে তোমরা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে (অর্থাৎ কিয়ামতে) বিশ্বাসী হও। (এর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস এভাবে যে, আল্লাহ্ যখন এমন বিরাট বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তখন মৃতকে জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না? বাস্তবতার বিশ্বাস এভাবে যে, সত্যবাদী সংবাদদাতা একটি সম্ভাব্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। অবশ্যই তা সত্য ও নির্ভুল।) এবং তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে (ভূমণ্ডলে) পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং এতে সব রকম ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার পয়দা করেছেন। উদাহরণত টক ও মিষ্ট অথবা ছোট ও বড়। কোনটির এক রঙ ও কোনটি ভিন্ন রঙ। এবং রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির আঁধার দ্বারা) দিন (-এর উজ্জ্বলতা)-কে আচ্ছন্ন করে দেন। (অর্থাৎ রাতের আঁধারের কারণে দিনের আলো আচ্ছাদিত ও দূর হয়ে যায়। উল্লিখিত) এসব বিষয়ের মধ্যে চিন্তাশীলদের (বোঝার) জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) রয়েছে। (এর বিস্তারিত বর্ণনা দ্বিতীয় পারার

চতুর্থ রুকূর শুরুতে দ্রষ্টব্য।) এবং (এমনিভাবে তওহীদের আরও প্রমাণাদি আছে। সেমতে) যমীনে পাশাপাশি (এবং এতদসত্ত্বেও) বিভিন্ন খণ্ড রয়েছে (এগুলোর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার বটে)। আর আঙ্গুরের বাগান আছে এবং (বিভিন্ন) শস্যক্ষেত্র রয়েছে এবং খর্জুর---(বৃক্ষ) আছে। এগুলোর মধ্যে কতক এমন যে, একটি কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় এবং কতকের মধ্যে দু'কাণ্ড হয় না; (বরং মূল থেকে ডালা পর্যন্ত এক কাণ্ডই উঠে যায় এবং) সবগুলোকে একই পানি সিঞ্চন করা হয়। (এতদসত্ত্বেও) আমি এক প্রকার ফলকে অন্য প্রকার ফলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এসব (উল্লিখিত) বিষয়ের মধ্যে (ও) বুদ্ধিমানদের (বোঝার) জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লিখিত হয়েছে।

الٓمٓرٰ---এগুলো খণ্ড বর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত আল্লাহ্র ওহী ঃ প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহ্র কালাম এবং সত্য। কিতাব অর্থ কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কোরআন বোঝান যেতে পারে। কিন্তু عطف-এবং وَاوْ অক্ষরটি বাহ্যত বোঝায় যে, কিতাব এবং اَلَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكَ---দুটি পৃথক পৃথক বস্তু। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং اَلَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكَ-এর অর্থ ঐ ওহী হবে, যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসেছে। কেননা এবিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى---অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের খেয়াল খুশি আনুযায়ী কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ্র

পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কোরআনের তিলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তিলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাযে এগুলোর তিলাওয়াত হয় না।

অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا---অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থী নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হবে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কোরআন পাকে যেখানে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রাকৃত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ আকাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তা যেন চাক্ষুষ দেখার মতই। ---(রূহুল-মাআনী)

এরপর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ — অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণ কম-বেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে।

এ সব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবত একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্বে।

প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা; মানবীয় পরিচালনা নামে-মাত্র ঃ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন।

সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। জাগতিক বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।

আল্লাহ্‌র শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা-আপনি এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের শারীরিক সামর্থ্য ও কারিগরী বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌রই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ—অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ—অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করে পরকাল ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا—তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য

এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর একে একটি ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক ফল্গুধারার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ—অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করছেন ঃ লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ-এর অর্থ দু' না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ-এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে ; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ— অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন ; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ—নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۝

অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর জমি ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ; তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায়; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে; যেমন খেজুর বৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারের ছোট ও বড়।

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে---শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়; যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ---নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়---যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ
أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٨

(৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোযখী, এরা তাতে চিরকাল থাকবে। (৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটেন। (৭) কাফিররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ,) যদি আপনি (তাদের কিয়ামত অস্বীকার করার কারণে) আশ্চর্যান্বিত হন, তবে (বাস্তবিকই) তাদের এ উক্তি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য যে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখন (মৃত্তিকা হয়ে) আমরা আবার কি কিয়ামতে নতুনভাবে সৃজিত হব? (আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, যে সত্তা উপরোক্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে প্রথমত সক্ষম, পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কেন কঠিন হবে? এ থেকেই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার জওয়াব হয়ে গেছে এবং নবুয়ত অস্বীকার করার জওয়াবও এতেই নিহিত রয়েছে। কেননা, পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার উপরই এটি ভিত্তিশীল। ফলে প্রথমটির জওয়াব দ্বারা দ্বিতীয়টির জওয়াব হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের জন্য আযাবের সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে যে) এরাই স্বীয় পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। (কেননা পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি দ্বারা পালনকর্তার শক্তি ও ক্ষমতা অস্বীকার করেছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করা দ্বারা নবুয়ত অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং এদের গর্দানে (কিয়ামতে) শৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা দোযখী। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। এরা বিপদ মুক্ততার (মেয়াদ শেষ হওয়ার) পূর্বে আপনার কাছে বিপদের (অর্থাৎ বিপদ নাযিল হওয়ার) তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হলে আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাবকে খুব অবান্তর মনে করে) অথচ তাদের পূর্বে (অন্য কাফিরদের উপর) শাস্তির ঘটনাবলী ঘটেছে। (সুতরাং তাদের উপর শাস্তি এসে যাওয়া অসম্ভব কি?) এবং (আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু---একথা শুনে তারা যেন ধোঁকায় না পড়ে যে তাহলে আমদের আর কোন আযাব

হবে না। কেননা, তিনি শুধু ক্ষমাশীল দয়ালুই নন এবং সবার জন্যই ক্ষমাশীল দয়ালু নন; বরং উভয় গুণ যথাস্থানে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ) এটা নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা মানুষের অপরাধ তাদের (বিশেষ পর্যায়ের) অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন এবং এটাও নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা কঠোর শাস্তি দেন। (অর্থাৎ তাঁর মধ্যে উভয় গুণ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রকাশ পাওয়ার শর্ত ও কারণ রয়েছে। অতএব, কাফিররা কারণ ছাড়াই নিজেদেরকে দয়া ও ক্ষমার যোগ্য কিরূপে মনে করে নিয়েছে; বরং কুফরীর কারণে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ (তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা)। এবং কাফিররা (নবুয়ত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলেঃ তাঁর প্রতি বিশেষ মু'জিযা (যা আমরা চাই) কেন নাযিল করা হল না? (তাদের এ আপত্তি নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, আপনি মু'জিযার মালিক নন, বরং) আপনি শুধু (আল্লাহ্র আযাব থেকে কাফিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী। আর নবীর জন্য বিশেষ মু'জিযার প্রয়োজন নেই---যে কোন মু'জিযা হলেই চলে, যা প্রকাশিত হয়ে গেছে।) এবং (আপনি কোন একক নবী হন নি। বরং অতীতে) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক হয়েছে। (তাদের মধ্যেও এ রীতিই প্রচলিত ছিল যে, নবুয়ত দাবী করার জন্য যে কোন প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে---বিশেষ প্রমাণ জরুরী মনে করা হয়নি।) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা কিছু নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কোচন ও বর্ধন হয়। আল্লাহ্র কাছে প্রত্যেক বস্তু বিশেষ পরিমাণ নিয়ে আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম তিন আয়াতে কাফিরদের নবুয়ত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব রয়েছে এবং এর সাথে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

কাফিরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। এক. তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে অবিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁদের নবুয়ত অস্বীকার করত। কোর-আন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলতঃ এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফিররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে? এটা কি সম্ভবপর? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়,; কিন্তু পুনর্বার তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফিররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হিকমতসহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবত অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে, একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একত্রিত নয় কি? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কেন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি---পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু তার ভিতরকার, পানি তার ভিতরকার এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্র শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এত-দুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন।